শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী
যে
ভালবাসা
মুমিনকে
কাঁদায়

যে ভালোবাসা মুমিনকে কাঁদায়

সংকলন
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
মুহাদ্দিসঃ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৩২-৩২২১৫৯

যে ভালোবাসা মুমিনকে কাঁদায়

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

প্রকাশক : খালিদ হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস

প্রকাশনায় : আত্-তাওহীদ প্রকাশনী
৭৯/ক/৩ বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, জমঈয়ত ভবন,
উত্তর যাত্রাবাড়ী- ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০১৭১২৫৪৯৯৫৬, ০১৮৪১৫৪৯৯৫৬
ই-মেইল : atpbd04@gmail.com; fb/ATP.BD

প্রকাশ কাল : অক্টোবর ২০২০ ইং; সফর ১৪৪২ হিজরী
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০২১ ইং; শাওয়াল ১৪৪২ হিজরী

অঙ্গসজ্জা : ওমর ফারুক, আত্-তাওহীদ কম্পিউটার্স
প্রচ্ছদ : গ্রাফিকো মিডিয়া

মূল্য: ৪৫ (পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

ভূমিকা

প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ওয়াজিব। তাঁর প্রতি অন্তর দিয়ে পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসা পোষণ না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এরশাদ করেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।"

(সহীহুল বুখারী, হা. ১৫; সহীহ মুসলিম, হা. ৪৪)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসার দাবিতেই তাঁর পবিত্র পরিবারকে ভালোবাসা আবশ্যক। তাঁর পবিত্র পরিবারের প্রতি ভালোবাসা না রাখলে তাঁর প্রতি কারো ভালোবাসাও পরিপূর্ণ হবে না। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবাসতে হলে যেমন তাঁর পবিত্র জীবনী পাঠ করা আবশ্যক। তেমনি তাঁর পবিত্র পরিবারকে ভালোবাসতে হলে আহলে বাইত তথা নাবী পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। আমরা তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা পোষণের যতই দাবি করি না কেন, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে না জানলে সেই ভালোবাসা যথার্থ হবে না। তাঁরা দ্বীনের জন্য যত কষ্ট করেছেন, তার ইতিহাস অধিকাংশ মুসলিমই জানে না। তাই তাদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা তৈরি করতে হলে তাদের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

নাবী পরিবারের সদস্য বলতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ, তাঁর পবিত্র কন্যাগণ, তাঁর কন্যাদের সন্তান-সন্ততি, আলী বিন আবু তালেব, তাঁর সন্তানগণ, জা'ফর বিন আবু তালেব, তাঁর সন্তানগণ, আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাদের মুমিন বংশধর উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিশ্বনাবীর বংশধর হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রিয়নাবী ও পরিবারের প্রতি ভালোবাসার দাবিতেই আমি এই পুস্তকে প্রিয় নাবীর চারজন কন্যার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস তুলে ধরছি। কারণ প্রিয় নাবীর কন্যা হিসেবে তাদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশাকরি বইটি ভালোভাবে পাঠ করলে দ্বীনি ভাই বোনদের অন্তরে নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষভাবে আমাদের মেয়েরা নাবীর কন্যাদের সম্পর্কে অনেক বিষয় জানতে পারবে এবং তাদের পথে উভয় জগতে ধন্য হবে।

তথ্য ও ভাষাগত কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে পাঠক মহল আমাকে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন বলে আশা রাখি।

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বড়ো মেয়ের নাম যায়নাব। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর গর্ভজাত প্রথম সন্তান। নবুওয়াতের পূর্বেই তার জন্ম হয় এবং ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বেই নাবী পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে বিবাহের বয়সে উপনীত হন।

মক্কার স্বনামধন্য কুরাইশী যুবক আবুল আস ইবনুর রাবী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসলো। তখনো তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হননি। আবুল আস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, আমি আপনার বড়ো মেয়ে যায়নাবকে বিয়ে করতে চাই। আপনি কী আমার কাছে যায়নাবকে বিয়ে দিবেন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যায়নাবের কাছে জিজ্ঞাসা না করে আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারছি না। তুমি অপেক্ষা করো। আমি যায়নাবের মতামত জেনে নিই।

তিনি বাড়িতে প্রবেশ করে যায়নাবকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, তোমার খালাতো ভাই আমার কাছে এসেছে। সে তোমার নাম উল্লেখ করেছে এবং তোমার প্রতি তার আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছে। তুমি কী তাতে রাজি আছো? একথা শুনে যায়নাব এর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং মুচকি হাসলেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়নাব এর সম্মতি পেয়ে বাড়ির বাইরে আসলেন। অতঃপর আবুল আসকে সম্মতি জানালেন। এরপর যায়নাব কে আবুল আসের সাথে বিয়ে দিলেন। যায়নাব ও আবুল আস সফল দম্পতি হিসেবে জীবন যাপন করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে গড়ে উঠল ভালোবাসার গভীর সম্পর্ক। তাঁদের সংসার আলোকিত করতে আল্লাহ সন্তান দান করলেন; যায়নাব দুই সন্তানের মা হলেন। তাদের একজন হলো আলী, অন্যজন উমামা।

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ওহী আসা শুরু হলো এবং তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়ে মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানালেন। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

বর্ণিত হয়েছে, আবুল আস একদা ভ্রমণে গেল। ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে জানতে পারলো, তার স্ত্রী যায়নাব পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছে। সে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিকটে গেল। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন আবুল আসকে বললেন, আমি তোমাকে একটা বিরাট সুখবর দিবো। অতঃপর যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামীকে ইসলাম গ্রহণের কথা জানালেন। একথা শুনে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে ছেড়ে আবুল আস উঠে চলে গেল।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এতে বিস্মিত হলেন এবং তার পিছু পিছু চলতে লাগলেন। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছিলেন, আমার পিতাকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত দান করেছেন। আর আমি তাতে বিশ্বাস করে মুসলিম হয়েছি। আবুল আস বলল, তাহলে তুমি আমাকে আগে বললে না কেন? এরপর তাদের দাম্পত্য জীবনে ভয়াবহ সমস্যা শুরু হলো। এই সমস্যার একমাত্র কারণ ছিল আক্বীদা-বিশ্বাস ও আদর্শ। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, বিপরীতে আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেনি।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আমার পক্ষে আমার পিতাকে মিথ্যা জ্ঞান করা অসম্ভব। আর আমার পিতা মিথ্যাবাদীও নন। তিনি সত্যবাদী; বিশ্বস্ত। আর আমি একাই তাঁর প্রতি ঈমান আনিনি। আমার মা ও বোনেরাও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। উসমান বিন আফফানও ঈমান এনেছেন। আলী বিন আবু তালেবও তাঁর প্রতি বিশ্বাসী। আপনার বন্ধু আবু বকরও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।'

এসব কথা শোনার পর আবুল আস বলল, লোকেরা বলবে, অমুক তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্য স্বীয় গোত্রকে বর্জন করেছে এবং বাপ-দাদাদেরকে

অপমান করেছে, এটা আমি পছন্দ করি না। তবে এই কথা ঠিক যে, তোমার পিতা মিথ্যুক নন।

আবুল আস আর ঈমান আনলো না, সে কুফুরীর উপরই থেকে গেল। আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করবে, এই আশায় যায়নাব এরপর একে একে বিশ বছর ধৈর্য ধারণ করলেন। এরই মধ্যে মুসলিমদের উপর হিজরতের হুকুম আসলো। যায়নাব তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে গিয়ে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি কি আমাকে আবুল আসের সাথে থাকার অনুমতি দিচ্ছেন? আমি কি তাঁর সাথেই থেকে যাব? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তোমার স্বামী ও সন্তানের সাথে থেকে যাও।

দ্বিতীয় হিজরী সালে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় পর্যন্ত যায়নাব তার স্বামীর সাথে মক্কাতেই ছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় আবুল আস সিদ্ধান্ত নিল যে, কাফেরদের সাথে সেও যুদ্ধে শরীক হবে।

যায়নাবের স্বামী আবুল আস তাঁর পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে! যায়নাব কে মক্কায় রেখে সে বদরের যুদ্ধে যাবে; এটা জেনে তিনি আতঙ্কিত হলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি যেন এমন একটি দিনের সম্মুখীন না হই, যেখানে আমার সন্তান ইয়াতীম হবে অথবা আমি পিতৃহারা হব।

যায়নাব এর স্বামী আবুল আস বিন রবী মক্কার অন্যান্য কাফেরদের সাথে বদরের পথে বের হলো। বদরের যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনীর তুলনায় কাফের বাহিনীর সংখ্যা তিনগুণ হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলিম বাহিনীর কাছে শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হলো।

নিহত হলো সত্তরজন কাফের। বন্দী হলো আরো সত্তরজন। যায়নাবের স্বামী আবুল আস বন্দী হলো তাঁর পিতার হাতে। কাফেরদের পরাজয়ের খবর দ্রুত পৌঁছে গেল মক্কায়। যায়নাব জিজ্ঞাসা করলেন, আমার

পিতার কী হয়েছে? তাঁকে বলা হলো, মুসলিমদের বিজয় হয়েছে। এ খবর শুনে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার স্বামীর কী হয়েছে? তাঁকে বলা হলো, তাঁর পিতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বন্দী করেছে এবং মুসলিমদের হাতে মদীনায় আটক আছে। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তাহলে আমার স্বামীকে ছাড়িয়ে আনতে আমি লোক পাঠাবো। কিন্তু স্বামীর মুক্তিপন হিসেবে পাঠানোর মতো তেমন কোনো সম্পদ যায়নাবের কাছে ছিল না। তাই তিনি তার গলার হার খুলে ফেললেন। এ হারটি তার মা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে অলংকৃত করত। আর আবুল আসের সাথে বিয়ের সময় তিনি এটা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে উপহার দিয়েছিলেন।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতার নিকট থেকে বন্দী স্বামীর মুক্তির জন্য খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর স্মৃতিবিজড়িত সেই হার খুলে তার দেবর বা আবুল বাসের কাছে দিয়ে দিলেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দীদের পাশে বসা ছিলেন এবং মুক্তিপণ আদায় করছিলেন ও বন্দীদেরকে ছাড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মুক্তিপণের মধ্যে তাঁর স্ত্রী খাদীজার গলার সেই হারটি দেখতে পেলেন। হারটি দেখেই তাঁর মনের পর্দায় খাদীজার রাদিয়াল্লাহু আনহা স্মৃতি ভেসে উঠল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কাকে মুক্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে বলা হলো, যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্য এটা পাঠানো হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, এটা কি খাদীজার হার? এটা কি খাদীজার গলার হার?

অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, হে লোক সকল! আবুল আস খুব নিকৃষ্ট মানুষ। তবে সে আমার সাথে কথা বলেছে, সত্য বলেছে এবং আমার সাথে ওয়াদা রক্ষা করেছে। তোমরা যদি চাও যে, এই লোকটির মুক্তিপণ ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমরা তাকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে

দিবে, তাহলে সে মুক্তিপণ ছাড়াই মক্কায় ফেরত যাবে। আর আমি এটাই পছন্দ করি। আর তোমরা যদি তা করতে অস্বীকার করো এবং দাবি করো যে, অন্যান্য কাফেরদের মতোই তার কাছ থেকেও পূর্ণ মুক্তিপণ আদায় করা হবে, তাহলে তোমাদের দাবিটাই বাস্তবায়িত হবে। আমি তোমাদের উপর মোটেও অসন্তুষ্ট হব না।

সুবহানাল্লাহ! প্রিয় পাঠক! নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহত্তের কথা চিন্তা করুন! তিনি ইচ্ছা করলে আবুল আসের ব্যাপারে একাই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, হে মুসলিমগণ! তোমরা চাইলে আমার পছন্দ মোতাবেক করতে পারো...।

সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু রা বলল, আপনি যা পছন্দ করেছেন, আমরা তার বিপরীত করতে পারি না। আপনি যা পছন্দ করেছেন, আমরাও তা পছন্দ করি। আবুল আসকে আমরা বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দিতে রাজি আছি।

সকলের সম্মতিতে আবুল আসকে ছেড়ে দেওয়া হলো। যায়নাবের হার যায়নাবের কাছে ফেরত দেওয়া হলো। তবে আবুল আসের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়া হলো যে, সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে মদীনায় তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে দিবে। কারণ, যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা আর আবুল আসের সাথে থাকতে রাজিও নয়। তবে স্বামী হিসাবে যায়নাবের হৃদয় আবুল আসের প্রতি ভালোবাসায় ভরপুর ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল আক্বীদাহ-বিশ্বাসের। যাই হোক আবুল আস মক্কায় ফিরে গিয়ে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বলল, তুমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আমি মুসলিমদের সাথে অঙ্গীকার করেছি। তাদের সাথে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি না।

স্বামীর প্রতি ভালোবাসা যতই থাকুক না কেন, এটা আসমানের সিদ্ধান্ত। তাকে আলাদা হতেই হবে। স্বামীর বিচ্ছেদ কতই না বেদনাদায়ক! আবুল আসও কোনোদিন ভাবেনি যে, যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু

যায়নাবের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে ঈমান ও পিতার নিকট হিজরত। স্বামী-সন্তান কিংবা দুনিয়ার অন্য কোনো স্বার্থ একজন মুমিনকে তার প্রভুর পথে এগিয়ে যেতে মোটেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

যায়নাবের পালক ভাই যায়েদ বিন হারেছা মক্কার বাইরে অপেক্ষা করছিল যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই আবুল আস তার ভাই কেনানা বিন রবীআর সাথে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে পাঠিয়ে দিলো। কেনানা সকাল বেলা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে নিয়ে বের হলো। মক্কায় ছিল তখন বদর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি। মহিলারা কাঁদছিল স্বজন হারানোর ব্যথায়। তারা যখন জানতে পারলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা তাঁর পিতার কাছে চলে যাচ্ছে, তখন দৌড়িয়ে এসে তারা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে ঘিরে ধরলো। তারা তাঁর উপর আক্রমণ করতে উপক্রম হলো।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। তখন তিনি গর্ভবতী অবস্থায় ছিলেন। হাব্বার বিন আসওয়াদ নামক এক কাফের যায়নাবের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করতে চাইলো। ভয়ে ভীত হয়ে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা উটের পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। এতে তার পেটের বাচ্চাটি পড়ে গেল। কেনানা বিন রবীআ তখন বলল, আল্লাহর কসম! যায়নাবের কাছে কেউ আসা মাত্রই এই অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করব।

এই সঙ্কটময় মূহুর্তে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করলেন। আবু সুফিয়ান বিন হারব তখন সেখানে এসে বলল, হে কেনানা! তুমি দিনের বেলায় মানুষের সামনে দিয়ে যায়নাবকে নিয়ে বের হয়ে সঠিক কাজ করোনি। তুমি তো জানো, বদরের যুদ্ধে আমাদের কী পরিণতি হয়েছে? দিনের বেলায় সবার সামন দিয়ে মুহাম্মাদের কন্যার বের হয়ে যাওয়াটা মানুষের জন্য অপমানের উপর অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে নিয়ে বাড়িতে চলে যাও। রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন তাকে নিয়ে চুপচাপ বের হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

আবু সফিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক কেনানা যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা কে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল। অতঃপর রাতের অন্ধকারে তাকে নিয়ে বের হয়ে মক্কার বাইরে অপেক্ষমাণ কাফেলার সাথে মিলিয়ে দিলো। যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা চলে আসলেন মদীনায় তাঁর সম্মানিত পিতার নিকটে।

দুই বছর পিতা থেকে আলাদা থাকার পর যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা মিলিত হলেন তাঁর পিতার সাথে। বাস্তবায়িত হলো তার পিতার সাথে মিলিত হওয়ার স্বপ্ন। তাই এই ঘটনা যেমন একদিক থেকে তার জন্য আনন্দদায়ক, অন্যদিকে বেদনাদায়কও বটে। কেন বেদনাদায়ক?

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা হিজরতের আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহুমা মাতৃহারা হয়ে আগে থেকেই পিতার সাথেই রয়েছেন। তাদের ঘটনা যায়নাবের বেদনাদায়ক ঘটনার চেয়ে কম নয়। এবার বিশ্বনাবী রহমতে আলম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে একসাথে দুই কন্যা স্বামীহারা হয়ে এক অজানা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় কালাতিপাত করছেন! যায়নাব ও উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। প্রিয় পাঠক! একবার সেই অবস্থাটা একটু কল্পনা করে দেখুন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও নেতার ঘরে আমাদের ভাষায় স্বামী পরিত্যাক্তা কন্যা! এটা ভাবলে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হলেই আমরা আমাদের ঈমানের অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারব। কারণ তাদের এই অবস্থার জন্য একটাই কারণ ছিল: ঈমান! আল্লাহর একত্বকে মেনে নেওয়া। ঈমানের দাবী এটাই যে, সবকিছুর উপর আল্লাহকে প্রাধান্য দিতে হবে; সেটা ব্যক্তিগত বা সামাজিক হোক। পরের অধ্যায়ে আমরা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমের ঘটনাও উল্লেখ করব।

বিশ্বনাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে যেমন নবুওয়াত ও রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছেন, অন্যদিকে একসাথে মাতৃহারা চারটি মেয়ের পরিচর্যা করছেন। সুবহানাল্লাহ!

তারা বিশ্বনাবীর মেয়ে। তারা সমাজের অন্যান্য মেয়েদের মতো নয়। স্বামী, সন্তান ও সংসার নিয়ে সুখে থাকার চেয়ে পিতার সুখ-দুঃখ ভাগাভাগী করে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। পিতার প্রতি নেই তাদের কোনো আপত্তি, নেই কোনো অভিযোগ। আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালাতে সন্তুষ্ট হয়েই তারা পিতার সাথে পার করছেন বছরের পর বছর। সমাজের অন্যান্য মেয়েরা তাদের স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে আছেন, এতে তাদের নেই কোনো হিংসা, নেই আক্ষেপ, দুঃখ। তবে অন্যান্য নারীদের মতোই স্বামী-সন্তান ও সংসারের মায়া-মমতা ও ভালোবাসা নিয়ে জীবন-যাপনের স্বাদ-আহ্লাদ যে তাদের হৃদয়ে নেই তাই বা বলি কি করে?

যাই হোক, এভাবেই তারা সৃষ্টি করলেন কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম নারীদের জন্য ধৈর্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত। যুগের পর যুগ ঈমানদার নারীরা শিক্ষা নিবে তাদের থেকে; তাদের থেকেই শিক্ষা নিবে স্বামীর আদর-সোহাগ বঞ্চিত নারীরা। মুসলিম পিতাদেরকে এভাবেই আল্লাহ কন্যা সন্তানদের দ্বারা পরীক্ষা করবেন। নিয়তির ফয়সালা মেনে নিয়ে চলে আসতে পারে তাদের বিবাহিত কন্যারা নিজ নিজ স্বামীর সংসার ছেড়ে। কারো ঘরে আসতে পারে একজন, কারো দুইজন। হতে পারে বিশ্বনাবীর মতোই তিনজন বা আরো বেশি। ঈমানের বলে বলিয়ান পিতাদের এতে নিরাশ হওয়ার সুযোগ নেই। তাকে বিশ্বনীর আদর্শে আদর্শবান হয়ে পর্বত সদৃশ মনোবল নিয়ে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে হবে। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বোত্তম বান্দার জীবনীতে এমনটি ঘটিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানদার পিতাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

আবার ফিরে আসি যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ঘটনায়। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতার বাড়িতেই থাকছেন। পিতার কাজে বোনদেরকে নিয়ে সাহায্য করছেন। কিন্তু আবুল আসের প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান শেষ হয়ে যায়নি। তার আশা, হয়তোবা আবুল আস একদিন সুপথে ফিরে আসবে। নতুনভাবে ফিরে পাবে তার হারানো দিনগুলো। এই আশায়

হয়তোবা অন্যত্র বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করেছে বারবার। সম্ভবত আবুল আসও ভুলতে পারেনি যায়নাবের ভালোবাসা। সেও আর কোনো মেয়েকে বিয়ে করেনি।

আবুল আস আসবে। এই আশায় থাকতে থাকতে কেটে গেল চার চারটি বছর। এরই মধ্যে একবার আবুল আস তার বন্ধুদের সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলো। কিন্তু ফেরার পথে ভাগ্যক্রমে মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে সে বন্দী হয়। তবে সে মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং জান বাঁচানোর জন্য অতি গোপনে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। মদীনায় গিয়ে রাতের অন্ধকারে যায়নাবের থাকার ঘরটি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। ঘরের দরজায় করাঘাত করার সাথে সাথেই যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা আগন্তুকের পরিচয় জানতে চায়। আবুল আস তখন বলল, আমি আবুল আস বিন রবীআ। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এতে বিস্ময়ে অবাক হলেন। বললেন, তুমি এখানে কেন এসেছো? সে বলল, হে যায়নাব! আমি মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে এসেছি। আমাকে একটু আশ্রয় দাও।

জাহেলী যামানার একটি রীতি ছিল, কোনো লোক কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিলে অন্যরা তার উপর আক্রমণ করত না। যদিও সে তাদের শত্রুপক্ষের লোক হয়। আর এটা ছোটো-বড়ো, মুসলিম-অমুসলিম, উঁচু-নীচু ও নারী-পুরুষ সবার জন্যই সমান ছিল।

এটা সত্যিই বিরল ঘটনা। কুরাইশদের একজন নেতৃস্থানীয় লোক মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে পালিয়ে এসে মুসলিমদের সর্বাধিনায়ক মুহাম্মাদের মেয়ের ঘরে এসে এবং তার কাছেই আশ্রয় চাচ্ছে!

এখানে বিষয়টা এমন নয় যে, আবুল আস যায়নাবের স্বামী। তাই তাকে আশ্রয় দিতে হবে। বিষয়টি এমনও নয় যে, আবুল আসের পক্ষ হতে যায়নাবের একটি কন্যা সন্তান ছিল বলে আশ্রয় দিতে হবে। যার নাম

উমামা বিনতে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহা, যাকে কাঁধে বহন করেই নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতেন। যেমনটি রয়েছে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায়। তাই তার জন্য কিছু একটা করতে হবে। আবুল আসের প্রতি যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভালোবাসা থাকলেও এখন তা প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নেই। এখন নীতি ও আদর্শ সমুন্নত রাখাটাই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। নাবীজির কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কখনোই তার ব্যতিক্রম করতে পারে না।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা সেই রাতটা বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে অনিদ্রায় কাটালেন। আবুল আসের ব্যাপারে তিনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে রাতের অন্ধকার ভেদ করে ফজরের আলোতে পূর্ব আকাশ আলোকিত হলো। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্য মহিলা সাহাবীর মতোই তার পিতার ইমামতিতে ফজরের সালাতের জন্য মসজিদে গেলেন। এতক্ষণেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল আসের বিষয়ে কিছুই জানতে পারেননি। তিনি যখন তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করলেন, তখন মসজিদের পেছন থেকে একটি উঁচু আওয়াজ শোনা গেল। কী সেই আওয়াজ? কেই বা করছেন সেই আওয়াজ? বিষয়টাই বা কী?

আওয়াজটি ছিল যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। তিনি বলছেন, তোমরা সাক্ষী থাকো। আমি আবুল আস বিন রবীআকে নিরাপত্তা দিচ্ছি!

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার প্রয়োগ করেছেন মাত্র। একজন সাধারণ মুসলিম অন্য যে-কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিতে পারে। ইসলাম এই অধিকার সকলকেই দিয়েছে। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কেবল সেটাই প্রয়োগ করেছেন এবং তা ব্যবহার করেছেন। তার স্বামী কিংবা তার গর্ভজাত সন্তানের পিতা হিসেবে নয়। এমনকি এর মাধ্যমে তিনি তার স্বামীকে সুকৌশলে নিজের ঘরে ফিরিয়ে এনে নতুনভাবে সুখের সংসার গড়বেন এমন ধারণারও কোনো সুযোগ এখানে নেই। বরং সে যুগের রীতি এটাই ছিল যে, শত্রুর কেউ আশ্রয় চাইলেও, আশ্রয় দেওয়া হতো।

এই ঘটনা ইসলাম বিদ্বেষী ঐসব লোকদের দাবিকে খণ্ডন করে, যারা বলে ইসলাম রক্ত পিপাসু এবং ইসলাম কেবল তলোয়ারের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি যদি এরকমই হতো, তাহলে কি সাহাবীরা আবুল আসকে চিনতে পেরেই তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতেন না? এই ঘটনায় তাদের কথারও প্রতিবাদ রয়েছে, যারা বলে সাহাবীগণ رضي الله عنهم বল প্রয়োগ করে মানুষকে মুসলিম বানিয়েছে। বিষয়টি যদি সেরকমই হতো, তাহলে সাহাবীগণ رضي الله عنهم আবুল আসকে বলত, তুমি কালেমা পড়; অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে ফেলব। কিন্তু তারা رضي الله عنهم কোনোটাই করেননি।

এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বললেন: আমি যা শুনেছি, তোমরাও কি তা শুনেছো? তারা رضي الله عنهم বললেন, হ্যাঁ আমরা তা শুনেছি। তিনি বললেন: এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত কিছুই জানি না। অতঃপর বললেন: তবে মুসলিমদের সর্বনিম্ন একজন লোকের নিরাপত্তা প্রদানও গ্রহণযোগ্য। অতঃপর তিনি বললেন: হে যায়নাব! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিচ্ছো, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। মুসলিমগণও যায়নাবের নিরাপত্তাকে মেনে নিলেন।

বিদায়া ওয়ান নিহায়া এবং আল-ইসাবা নামক গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের সামনে বললেন, হে যায়নাব! তুমি আবুল আসকে সম্মান করো। তবে সে যেন তোমার কাছে আসতে না পারে। কারণ, সে কাফের! তোমার জন্য সে হালাল নয়।

অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা চাইলে আবুল আসের মাল-পত্র আটকিয়ে রাখতে পারো, ইচ্ছা করলে তা ফেরত দিতে পারো। তখন মুসলিমগণ رضي الله عنهم তাকে তার মালপত্রসহ ছেড়ে দিলো।

আবুল আস নাবী পরিবারের উদারতা নিয়েই যে মক্কায় ফিরে গেল তা নয়; বরং মদীনার মুসলিম সমাজের ইনসাফ, দয়া-মমতা ও উদারতার শিক্ষা নিয়ে নিজ দেশে নিরাপদে ফিরে গেল।

মক্কায় গিয়ে আবুল আস স্বীয় মাল-পত্র নামালো। অতঃপর সকলের পাওনা পরিশোধ করে কুরাইশদের সামনে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আমার কাছে কারো কোনো পাওনা আছে কি? সকলেই বলল, না। আমাদের হক আমরা বুঝে পেয়েছি। এবার তিনি সবার সামনে ঘোষণা করলেন, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله । আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘোষণা দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

কাফেররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে অবাক হলো। তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার আশ্রয়ে থাকা অবস্থাতেই ইসলাম গ্রহণ করতাম। কিন্তু তা করিনি এজন্য যে, তোমরা হয়তো ভাববে, তোমাদের গচ্ছিত অর্থ আত্মসাৎ করার জন্যই আমি ইসলামে প্রবেশ করে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছি।

অতঃপর তাঁর স্ত্রী-সন্তান ফেরত পাওয়ার আশা নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। মদীনায় এসে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দ্বিতীয়বার ইসলামের কালেমা পাঠ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, হে আবুল আস্! তুমি যখন যায়নাবের আশ্রয়ে মদীনায় অবস্থান করছিলে তখন ইসলাম কবুল করলে না কেন? তিনি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মনে মনে তখনই ইসলাম কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু মুখে তা এই ভয়ে উচ্চারণ করিনি যে, লোকেরা আমাকে এই বলে অভিযোগ দিবে যে, আবুল আস্ ভয়ে ভীত হয়ে এবং মাল ফেরত পাওয়ার আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে পূর্বের বিবাহেই আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে ফেরত দিলেন। অতঃপর আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাত ধরে যায়নাবের ঘরের দরজায় নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হে যায়নাব! এই তোমার চাচাতো ভাই আবুল আস আজ আমার কাছে এসেছে। তোমাকে

সে স্ত্রী হিসাবে ফেরত নিতে চায়। তুমি কি তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি আছো? পিতার কথা শুনে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা মুচকি হাসলেন।

দীর্ঘ চার বছর পর যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এর প্রতীক্ষার অবসান হলো। তিনি মিলিত হলেন তাঁর স্বামী আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে। পূর্বের চেয়ে আরো বেশি সুখময় জীবন-যাপন শুরু হলো। কিন্তু তাদের এ সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। প্রথমে তাদের একটি সন্তান আল্লাহর আহব্বানে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। সহীহুল বুখারীতে উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে বসে ছিলাম। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যায়নাব লোক পাঠিয়ে তাঁকে যেতে বললেন। কারণ তাঁর সন্তান মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে পাঠালেন, যাও গিয়ে কন্যাকে আমার সালাম বলো এবং তাকে আরো বলো,

أَنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى

"আল্লাহ যা নিয়েছেন, তা আল্লাহরই। যা তিনি দিয়েছেন, তাও তার। আর তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসের একটি নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে।"

আর কন্যাকে এ কথাও বলে দিও সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশা করে। লোকটি আবার এসে বলল, কন্যা শপথ করেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন অবশ্যই আসেন। এবার তিনি না গিয়ে পারলেন না। সা'দ বিন উবাদা এবং মুআয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর সাথে গমণ করলেন। শিশুটিকে উঠিয়ে নাবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের খেদমতে আনা হলো। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা শিশুটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে দিলেন। তখন তার প্রাণ ধড়ফড় করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

শিশুটির রূহ যেন একটি খালি কলসীর ভিতর নড়াচড়া করছিল। (অর্থাৎ খালি কলসীর ভিতর শুকনো কোনো জিনিস নড়াচড়া করলে যেমন শব্দ হয় শিশুটির ভিতর থেকে সেরকম শব্দ বের হচ্ছিল) এ দৃশ্য দেখে নাবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তখন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ কি দেখছি হে আলাহর রাসূল? নাবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ এ হলো রহমত (দয়া), যা আলাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আলাহ কেবল তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন।

আবুল আসের সাথে পুনর্মিলনের পরে দুই বছর জীবন যাপন করার পর প্রিয় নাবীর সৌভাগ্যবান কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় মক্কার এক কাফের বর্শা দ্বারা তাকে আক্রান্ত করেছিল। এই আঘাতে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা মাটিতে পড়ে যান এবং তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। সেই আঘাত ও গর্ভপাত জনিত রক্তক্ষরণের ক্ষতি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। পুনঃপুনঃ রোগের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। অবশেষে রোগ তীব্রতর হয়ে উঠে এবং তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। উম্মে আতিয়া, উম্মে আয়মান, সাওদা, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না তার গোসলে শরীক হয়েছিলেন। তারা উম্মে আতীয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহা নেতৃত্বে গোসল দিচ্ছিলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছিলেন।

উম্মে আতীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নিজে যায়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহকে গোসল দিচ্ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা করছিলেন। আর আমরা তা হুবহু পালন করছিলাম। তিনি বলছিলেন, প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার অথবা পাঁচ পাঁচবার ধৌত করো। গোসল দেওয়ার পর তার কাফন-দাফন সম্পন্ন হয়।

এতে ব্যথিত হলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ব্যথিত হলেন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এর স্বামী আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু। বর্ণিত হয়েছে যে,

যায়নাবের প্রতি আবুল আস رضي الله عنه এর ভালবাসা ছিল অতি গভীর। এ কারণেই তিনি তাঁর মৃত্যুর পর আর কোনো মহিলাকে বিবাহ করেননি। এ অবস্থাতেই তিনি যায়নাব رضي الله عنها এর মৃত্যুর চার বছর পর মৃত্যুবরণ করেন।

চলে গেছেন যায়নাব رضي الله عنها। চলে গেছেন আবুল আস رضي الله عنه। ধন্য হয়েছেন তাঁরা কিন্তু তাদের জীবনী কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম দম্পতির জীবন চলার দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে। তাঁদের পথে চললে আলোকিত হবে পরবর্তীদের জীবন, এটাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

যায়নাবের মৃত্যুকালে তাঁর দুটি সন্তান ছিল। একটি পুত্র। অন্যটি কন্যা। পুত্রের নাম আলী। আর কন্যার নাম উমামা। ঐদিকে যায়নাবের জীবদ্দশায় তার আরেকটি পুত্র সন্তানের মৃত্যুর কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আলী رضي الله عنه হিজরতের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করে। সে কখন কিভাবে মদীনায় হিজরত করে, তা আমরা জানতে পারিনি। তবে এটা জানা যপচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা তাকে সাথে রাখতেন। অনেক সময় তাকে জিহাদেও নিয়ে যেতেন। মক্কা অভিযানের সময়ও আলী رضي الله عنه তার নানার সাথে উটের পেছনে একই বাহনে বসা ছিল।

একমতে আলী তার পিতার জীবদ্দশায় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। অন্য মতে আবু বকর رضي الله عنه-এর খেলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে ধন্য হয়। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)

যায়নাবের কন্যা উমামা বিনতে আবুল আস্ রাসূল ﷺ এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি উমামা رضي الله عنهاকে স্বীয় কাঁধে বহন করতেন। এমনকি সালাত অবস্থায়ও তিনি উমামাকে কাঁধে রাখতেন। যখন সাজদায় যেতেন তখন নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন সাজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন আবার কাঁধে নিতেন। এ ব্যাপারে একাধিক সহীহ্ হাদীছে বিবরণ এসেছে।

আবু কাতাদা আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর কন্যা যায়নাবের মেয়ে উমামা বিনতে যায়নাবকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়তেন। উমামা رضي الله عنها এর পিতা ছিলেন আবুল আস বিন রাবীআ বিন আবদে শাম্‌স। নাবী ﷺ যখন সাজদায় যেতেন তখন উমামা رضي الله عنها কে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন।

উমামা رضي الله عنها প্রাপ্ত যৌবনে পদার্পন করার সাথেই আবুল আস رضي الله عنه এর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তার খালাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম رضي الله عنه কে অসীয়ত করে যান যে, তিনি যেন তার কন্যা উমামাকে সৎপাত্রে বিবাহ দেন। ঐদিকে ফাতিমা رضي الله عنها আলীকে অসীয়ত করেন যে, তিনি যেন তার মৃত্যুর পর ভগ্নিকন্যা উমামাকে বিবাহ করেন। অতঃপর আলী رضي الله عنه উমার ইবনুল খাত্তাবের খেলাফতকালে উমামা رضي الله عنهاকে বিবাহ করেন। ৪০ হিজরীতে আলী رضي الله عنه কুফায় নিহত হওয়া পর্যন্ত উমামা رضي الله عنها আলী رضي الله عنه র বিবাহধীনে ছিলেন। আলী رضي الله عنه র মৃত্যুতে অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হন।

আলী رضي الله عنه র পক্ষ হতে উমামা رضي الله عنها এর কোনো সন্তান হয়েছিল কি না, এব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। তবে একথা প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যায়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের رضي الله عنهن কোনো বংশধর জীবিত ছিল না। বংশধর কেবল ফাতিমা رضي الله عنها এর-ই ছিল।

আল্লাহ তাআলা উমামা (রা.)র উপর সন্তুষ্ট হোন, সন্তুষ্ট হোন তাঁর পিতা আবুল আসের উপর, তাঁর মাতার উপর এবং নাবী পরিবারের প্রত্যেক পুণ্যবান সদস্যের উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তর নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে ভরে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাদের সাথে তোমার প্রশস্ত জান্নাতে স্থান দাও। আমীন।

রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)

বিনতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এবার প্রিয় নাবীর অপর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের কথায় আসি। রুকাইয়্যা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর সরাসরি ছোটো এবং যায়নাবের পরে তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড়ো মেয়ে। নবুওয়াতের সাত বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য মেয়েদের মতোই ছিল তাদের জীবন, ছিল স্বপ্ন-স্বাদ। ছিল স্ত্রী হিসাবে স্বামীর ঘরে উঠার আশা। যেমনটি করে থাকে বনী আদমের প্রত্যেক নারীই। প্রশ্ন হচ্ছে, রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমের ভাগ্যে কি তা ঘটেছিল? না কি তাদের জন্য অপেক্ষায় ছিল এক অনাকাঙ্খিত ভ্যবিষ্যত?

যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথেই মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুরাইশ নেতা আবু লাহাবের দুই পুত্রের পক্ষ থেকে প্রিয় নাবীর দুই কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব আসে। উতবা বিন আবু লাহাব বিয়ে করবে রুকাইয়্যাকে আর উতাইবা বিয়ে করবে উম্মে কুলসুমকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যাদের অনুমতি নিয়ে এতে সম্মতি দিলেন। কন্যাদের ভবিষ্যত জীবনাকাশে উদিত হলো নূতন স্বপ্ন।

খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর দুই কন্যাকে একত্রে স্বামীর ঘরে ওঠিয়ে দিবেন। তাঁর বুক ভরা আনন্দ। মেয়ে দুটিকে প্রস্তুত করে নিজ নিজ স্বামীর বাড়িতে তুলে দেওয়ার ব্যস্ততার মধ্যে তার সময় পার হচ্ছে। এটাও ছিল নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা।

কিন্তু কী ঘটনা ঘটেছিল এরপর তাদের ভাগ্যে? একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ এক অনাকাঙ্খিত সংবাদ বাহক তাদের দরজায় করাঘাত করলো। সংবাদ বাহক উচ্চৈঃস্বরে বলে যাচ্ছিল, আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবা ও উতাইবা মুহাম্মাদের দুই কন্যা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়েছে।

কী কারণে এই তালাক?

খাদীজা যখন তাঁর দুই কন্যাকে তাদের বাসর ঘরে প্রবেশ করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এই সংবাদ তাঁর মাথায় বজ্রপাতের মতোই আঘাত করলো। কন্যাদের আর বাসর ঘরে যাওয়া হলো না। খাদীজা তার কলিজার দুটি টুকরাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন।

যেমন শান্ত করছিলেন রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম তাদের স্নেহময়ী মা খাদীজা কে। মুছে দিচ্ছিলেন দুঃখিনী মায়ের চোখের পানি। বলা হয়ে থাকে যে, খাদীজা আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে তাঁর কন্যার বিয়েতে প্রথমত রাজি ছিলেন না। কারণ, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের বদ চরিত্র ও কঠোর কথা-বার্তা খাদীজা এর কাছে গোপন ছিল না। কিন্তু কুরাইশদের নেতা আবু লাহাব যখন কুরাইশ বংশের অন্যান্য লোক নিয়ে কন্যাদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলো, তখন তাঁর পক্ষে তাতে বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

খাদীজা বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করেও এই আশঙ্কায় পিছিয়ে পড়লেন যে, কুরাইশরা এই অপবাদ দিবে যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর গোত্র বনী হাশেমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে।

তাই খাদীজা এর অপছন্দ সত্ত্বেও বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী নাযিল হলো। তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পেলেন। খাদীজা ই সর্বপ্রথম তাঁর স্বামীর দাওয়াত কবুল করলেন। তাঁর পথ ধরেই তাঁর চার কন্যাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। যায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা ।

কুরাইশদের কানে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের কথা পৌছালো, তখন তারা তাঁর ঘোর বিরোধী হয়ে

দাঁড়ালো। তারা তাঁকে বিভিন্ন অপবাদে জড়িয়ে দিলো এবং সর্বপ্রকার কষ্টে জর্জরিত করলো। শুরু করলো তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র। সর্বপ্রথম তারা যা করলো, তা হচ্ছে তারা তাঁর কন্যাদের স্বামী ও শ্বশুরদেরকে বলল, তোমরা মুহাম্মাদের কন্যাদেরকে নিজেদের ঘরে এনে তার মাথার বোঝা হালকা করে দিয়েছো। আর সে এই সুযোগে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। তোমরা তার কন্যাদেরকে ফেরত দাও এবং এর মাধ্যমে তাকে ব্যস্ত করে ফেল।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এর স্বামী আবুল আস তাদের কুমন্ত্রণায় সাড়া দেননি। কারণ, সে যায়নাবকে খুব ভালোবাসত। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এর স্থলে কুরাইশদের অন্য কোনো মেয়ে তার কাছে আসুক এটা সে কখনোই কামনা করেনি। সে যতই বংশ মর্যাদায় উন্নত ও সুন্দরী হোক না কেন। তাই সে কুরাইশদের কথায় কর্ণপাত করেনি।

কিন্তু আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল কুরাইশী অপশক্তির সাথে যোগ দিয়েছিল। সে ছিল ইসলাম ও ইসলামের নাবীর ঘোর বিরোধী। সে তার স্বামী আবু লাহাবের উপর চাপ দিলো। এতে আবু লাহাব তার দুই পুত্রকে বলল, মুহাম্মাদের দুই কন্যাকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে কোনো কথাই বলব না। পিতার কথা মেনে নিয়ে উতবা রুকাইয়্যাকে তালাক দিল আর উতাইবা উম্মে কুলছুমকে তালাক দিল ।

রাসূলের মেয়েরা কীভাবে এই মসীবতের মোকাবেলা করলেন? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারই বা কীভাবে এই দুঃসংবাদ গ্রহণ করেছেন? আমরা তা বিস্তারিত জানব। এটা কী রাসূলের সম্মান-মর্যাদায় সুস্পষ্ট আঘাত নয়? এটা কী তাঁর জন্য কষ্টদায়ক নয়? যেই পিতার ঘরে একসাথে দুটি কন্যা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে, সে-এই কেবল এই বেদনা বুঝতে পারবে।

"চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশি বিষে ধ্বংশেনি যারে" ।

পর্বত সদৃশ দৃঢ়তা, সবর-ধৈর্য ও ঈমানের সাথে এবং ভাগ্যের ফয়সালাকে মেনে নিয়ে তাঁরা এই কঠিন মুসীবতের মোকাবেলা করলেন। এই ভয়াবহ ও কঠিন পরীক্ষার সামনে টিকে থাকার জন্য এ ছাড়া নাবী পরিবারের আর কোনো শক্তি ছিল না।

রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম এটা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের পিতা সত্যের উপর রয়েছেন। এই সত্যকে বিজয়ী করার জন্য অবশ্যই তাঁকে চড়া মূল্য দিতে হবে। সুতরাং সত্যের বিজয় ও সাহায্যের জন্য সবকিছু মেনে নেওয়া তাদের জন্য মোটেই কঠিন নয়। তারা আরো বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাতিলের দাপট ক্ষণস্থায়ী। প্রথমত হয়তো দেখা যাবে যে, বাতিল জয়লাভ করেছে। কিন্তু এই বিজয় ক্ষণস্থায়ী। হকপন্থীদেরই হয় শুভ পরিণাম।

সত্য অবশ্যই জয়ী হবে। তবে কখন? এর সময় কেবল আল্লাহর নিকটেই। এটা আসা পর্যন্ত সবর করতেই হবে। তাই তারা সবর করলেন, তাদের পিতাও সবরের পথ ধরলেন এবং মাতাও তাই করলেন। তাদের সবাই পরস্পরকে সবর ও ধৈর্যের উপদেশ দিলেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই! প্রিয় মুসলিম বোন! আমরা যেন রাসূলের কন্যাদ্বয়ের কথা ভুলে না যাই। আজকেও কোনো মুসলিম যুবতীর ভাগ্যে আসতে পারে রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম র পরিণতি। এজন্যই হয়তো আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নাবীর কন্যাদেরকে অনাগতকালের মুসলিম মেয়েদের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন।

সেই সঙ্গে সমাজের মযলুম নারীরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিবে যে, সত্যের জয় নিশ্চিত। তবে কখন? সময়টা আল্লাহর হাতেই। বিজয় আসার পূর্ব পর্যন্ত সবর-ধৈর্য ধারণ করতেই হবে।

রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম র পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যাদ্বয়কে একথাই বলতেন, খাদীজা ও বারবার কন্যাদ্বয়কে একই কথা বুঝাতেন।

রুকাইয়্যা-উম্মে কুলসুম ﵄ চলে গেছেন দেড় হাজার বছর আগে, চলে গেছেন আল্লাহর রাসূল, চলে গেছেন উম্মুল মুমিনীন খাদীজা ﵂। কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া উপদেশ কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের মেয়েদের সামনে থাকবে সদা ভাসমান। এটাই আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

আমাদের মুসলিম ধার্মিক পর্দানশীন মেয়ে ও বোনদের জন্য এমন ছেলের প্রস্তাব আসতে পারে, যে ধার্মিকতা ও নারীর পর্দা পছন্দ করে না। সে বলতে পারে, আমি এমন কট্টরপন্থী ও মুখ ঢাকা পর্দা পছন্দ করি না। আমি চাই উদারতা ও আধুনিকতা। অমি চাই আমার স্ত্রী মুখ খুলবে, আমার ভাই-দুলাভাইদের সামনে যাবে। বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার সময়ই এমন কথা সে বলতে পারে। পর্দানশীন মেয়ে ও বোনদের পরিবার ও প্রস্তাবকারীর আত্মীয়-স্বজনরা এটা সমর্থনও করতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের পর্দানশীন ও ধার্মিক মেয়েরা যেন সস্তা বুলি শুনে নরম না হয়। দ্বীনের উপর তারা যেন রুকাইয়্যা-উম্মে কুলছুমের মতোই থাকে পর্বত সদৃশ।

রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম ﵄ তালাকপ্রাপ্তা হয়েছিলেন। এতে কারো উপর তাদের কোনো আক্ষেপ ছিল না। না পিতার উপর; না মাতা খাদীজা ﵂ এর উপর। না অন্য কারো উপর। কন্যাদ্বয় পূর্বের মতোই তাদের পিতার সহায়ক হয়েই জীবন তরী পার করতে থাকলেন। বোনেরা ও মা মিলে রাসূলের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হয়েই বসবাস করতে লাগলেন। ইতিহাস কিংবা জীবনীর কোনো কিতাবেই এমন কথা পাওয়া যাবে না, যেখানে কন্যারা তাদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেছে কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করেছে অথবা তাদের এই দুর্দশার জন্য নিজেদের পিতা-মাতাকে দোষারোপ করেছে। যেমনটা করে থাকে বর্তমানকালের মুসলিম মেয়েরা; সন্তানেরা। অল্পতেই পিতামাতাকে সকল দুর্দশা বা কঠিন কোনো সময়ের জন্য দায়ভার চাপিয়ে দেয়।

রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম رضي الله عنهما কে তালাক দেওয়ার মাধ্যমে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল নাবী পরিবারকে কষ্ট দিয়েছিল। তাদের কষ্ট এখানেই শেষ নয়। এ ছাড়াও তারা বিভিন্নভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল রাসূলের দাওয়াতী কাজের ঘোর বিরোধী ছিল। তাদের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলো, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "হে নাবী! তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো", তখন তিনি সাফা পাহাড়ের উপর আরোহন করে উঁচু কণ্ঠে কুরাইশদেরকে আহবান করলেন। তারা যখন সমবেত হলো, তখন তিনি বললেনঃ আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পেছনে শত্রুবাহিনী রয়েছে। তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা তো তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি বললেন: আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করো। অন্যথায় তোমরা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। (সহীহ বুখারী)

এ কথা শুনে আবু লাহাব ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বলল, অকল্যাণ হোক তোমার। এজনই আমাদেরকে একত্র করেছো? তার জবাবে আল্লাহ তাআলা সূরা লাহাব নাযিল করেন। আল্লাহ তাআলা তাতে বলেন, আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে উম্মে জামিল তার স্বামী আবু লাহাবের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতেন, উম্মে জামিল সেখানে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। সে যখন জানতে পারলো যে, তার বিরুদ্ধে ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে কুরআনুল কারীমে সূরা নাযিল হয়েছে, তখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল। তিনি

তখন কা'বা ঘরের নিকটে বসেছিলেন। সেখানে আবু বকর ﷺ ও ছিলেন। সে একটি পাথর হাতে নিয়ে তাদের দুইজনের সামনে দাঁড়ালো। আল্লাহ তখন তার চোখ অন্ধ করে দিলেন। সে শুধু আবু বকর ﷺ কেই দেখতে পেল। সে আবু বকর ﷺ কে বলতে লাগল, তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পেরেছি, সে না কি আমাকে গালি দিচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তাহলে এই পাথর দিয়ে তার মুখে আঘাত করব।

এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী কষ্ট দিতো। এসব কষ্ট দেখে তার দুই কন্যা নিজেদের কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে তাদের পিতাকে সান্ত্বনা দিতেন।

আবার ফিরে আসি উতবা ও উতাইবা কর্তৃক রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলছুম ﷺ কে অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়ার ঘটনায়। কী হয়েছিল এই দুই মেয়ের ভাগ্যে? তাদের ঘটনা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার এই বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আলাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"আর যে আলাহ্কে ভয় করে, আলাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করেন"।

(সূরা তালাক: ২-৩)

কিছুকাল পরেই কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের সন্তানের সাথে রুকাইয়্যার বিবাহের প্রস্তাব আসে। তিনি হলেন কুরাইশদের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী উসমান বিন আফফান ﷺ। উসমান ﷺ ছিলেন রুকাইয়্যা ﷺ র জন্য অতি উত্তম স্বামী। তার চারিত্রিক মাধুর্য, দানশীলতা ও সত্যবাদিতার কথা প্রত্যেক মুসলিমই অবগত রয়েছেন। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে অন্যতম।

এই বিয়েতে কুরাইশ কাফিররা অবাক হলো। তারা ভাবল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো একজন কুরাইশী ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত যুবক কীভাবে একজন বিপদ-দুর্দশাগ্রস্ত অসহায়ের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে! যাই হোক, এটাকে তারা মুহাম্মাদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ মনে করলো। তাই তারা মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। এর আগে তারা কেবল বেছে বেছে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করত। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উঁচু-নীচু, কুরইশী-অকুরাইশীর মাঝে কোনো পার্থক্য না করে সবার উপর নির্যাতন শুরু করলো।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই সাহাবীরা নির্যাতিত হচ্ছেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে রক্ষা করতে পারছেন না এবং তাদের উপর থেকে নির্যাতের পরিমাণ কমাতেও পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি হাবাশায় চলে যেতে! কেননা সেখানে একজন রাজা আছেন, যার নিকট কেউ নির্যাতিত হয় না। সুতরাং তোমরা সেখানে যেতে পারো। অতঃপর তোমরা যে কষ্টের মধ্যে আছো, তার অবসান ঘটলে তোমরা মক্কায় ফিরে আসতে পারবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অনুমতি পেয়ে এই দুইজন নব দম্পতি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাবাশায় হিজরত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জামাতার হিজরতের প্রশংসায় বলেছেন, আল্লাহর শপথ! ইবরাহীম ও লুত আলাইহিমাস সালামের পর তিনিই হলেন প্রথম হিজরতকারী। এই ঈমানী কাফেলায় মোট ১৬ জন ছিলেন। ১২জন পুরুষ ও চারজন নারী।

তারা অত্যন্ত গোপনে মক্কা থেকে বের হয়ে লোহিত সাগরের তীরে পৌছে যান। সৌভাগ্যক্রমে তারা সেখানে পৌছেই দুটি জাহাজ পেয়ে যান। জাহাজ দুটি হাবাশার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জাহাজের কর্মকর্তারা তাদেরকে ওঠিয়ে নিল এবং নিরাপদে আবিসিনিয়া পৌছে দিলো।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে আয়িশা র বড়ো বোন আসমা বিনতে আবু বকর তাদের সফরের সবকিছু প্রস্তুত করে দিয়ে সাগরের তীর পর্যন্ত এগিয়ে দেন। তাদেরকে বিদায় করে দিয়ে মক্কায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবরটি জানিয়ে আশ্বস্ত করেন।

এদিকে কুরাইশ কাফিররা সংবাদ পেয়ে তাদেরকে ধরার জন্য দ্রুতগতিতে সাগরের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু তারা সেখানে পৌছার আগেই মুহাজিরগণ জাহাজে উঠতে সক্ষম হন। ঐদিকে মাঝি মাল্লারা নোঙ্গর তুলে ফেলেছে। তাই ব্যর্থ হয়ে কুরাইশ কাফিররা মক্কা চলে আসে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই খবর পেয়ে খুশী হয়ে আবু বকর কে সম্বোধন করে বললেন, লুত এবং ইবরাহীম আলাইহিমাস সালামের পর উসমানই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হিজরত করেছে।

অতএব, রুকাইয়্যা তাঁর সম্মানিত পিতা-মাতা, শ্রদ্ধাভাজন বোনদেরকে ও প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন অন্য এক দেশে। সবকিছু ছেড়ে চলে গেলেন আল্লাহর রাস্তায়। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করার কষ্ট সহ্য করলেন তার অন্যান্য দ্বীনী বোনদের সাথে। সেখানে গিয়ে রুকাইয়্যা উসমান কে পেলেন একজন উত্তম স্বামী হিসাবে, যার সাথে উতবার কোনো তুলনাই চলে না। উসমান প্রবাসে রুকাইয়্যা -এর দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতেন। রুকাইয়্যা তাঁর পাশে পেলেন অন্যান্য মহিলা সাহাবীদেরকে। যেমন- আসমা বিনতে উমাইস, রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান এবং আরো অনেককেই। পরস্পরের সাথে ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা হাবাশায় সময় অতিক্রম করতে থাকলেন।

এরই মধ্যে রুকাইয়্যা গর্ভবতী হয়ে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়লেন। এতে তার পেটের সন্তানটি পড়ে গেল। তার বিপদে অন্যান্য মহিলা

সাহাবীগণ নিজ বোনদের মতোই পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করলেন। ইসলামের আদেশ এটাই। এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য একটি প্রাচীরের মতোই। ঈমানী ভালোবাসার দাবী হচ্ছে একজন মুসলিম পুরুষ কিংবা নারী তার অপর ভাইয়ের জন্য সাধ্যানুযায়ী সবকিছুই করবে। এর বিনিময়ে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই কামনা করবে না।

আজ হয়তো আমরা ভেবে অবাক হই অথবা প্রশ্ন করি, কোথায় গেল সেই ঈমানী সম্পর্ক-ভ্রাতৃত্ব?

ফিরে আসি রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর প্রসঙ্গে। প্রথম সন্তান অপরিণত অবস্থায় পড়ে যাওয়ার পর অল্প সময়ের ব্যবধানে আল্লাহ তাআলা তাকে আরেকটি পুত্র সন্তান দিয়ে সম্মানিত করলেন। তিনি তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। সন্তানটি পেয়ে তিনি প্রবাস জীবনে সান্ত্বনা পেলেন। কিছুটা হলেও স্বজনদের থেকে দূরে থাকার দুঃখ-কষ্ট লাঘব হলো।

একদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দিত হয়ে রুকাইয়্যার কাছে প্রবেশ করে বললেন, হে রুকাইয়্যা! সুখবর গ্রহণ করো। বিপদ কেটে গেছে। কুরাইশরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সকলেই তোমার পিতার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। এতে রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা আনন্দিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তাহলে চলুন আমরা আমাদের প্রিয় ভূমি মক্কায় ফিরে যাই।

কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে হাবাশায় অবস্থানকারী মুহাজিরগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল বললেন, যেহেতু কুরাইশরা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে এবং মক্কায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এখন আর হাবাশায় থাকার দরকার নেই। আরেকদল খবরের সত্যতা যাচাই করা পর্যন্ত সেখানে থেকে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলেন। উসমান ও রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৩০জন। মক্কার

নিকটবর্তী এসে তাদের আনন্দ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। তারা জানতে পারলেন যে, কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। মক্কাবাসীরা কুফুরী ও শির্কের উপরই রয়ে গেছে এবং মুসলিমদের উপর আগের চেয়ে আরো বেশি নির্যাতন করছে।

যাই হোক রুকাইয়্যা তার প্রিয় মা-বাবা ও বোনদের দেখার জন্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। স্বীয় পিতার ঘরে গিয়ে আনন্দে পিতাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আনন্দের ক্রন্দনে চোখের পানি ফেললেন। দৌড়ে আসলো তার দিকে উম্মে কুলসুম, যায়নাব ও ফাতিমা। আনন্দঘন পরিবেশে বোনেরা পরস্পরের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলেন এবং একজনের সাথে অন্যজন কোলাকুলি করলেন।

এখন রুকাইয়্যা এর মনে প্রশ্ন। সকলেই দৌড়িয়ে আসলো তাকে স্বাগত জানানোর জন্য। আসলো না শুধু একজন। বোনদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মা কোথায়? তারা কোনো জবাব দিলেন না। এতে রুকাইয়্যা আকাশ বিদীর্ণকারী আওয়াজে মা মা করে ডাকতে লাগলেন। আশপাশের সকলের দিকে তাকালেন। সকলেই নীরবে দাঁড়িয়ে রইল এবং তার চোখের পানি বন্ধ করার চেষ্টা করলো।

এবার সে বুঝে নিলেন, তার স্নেহময়ী মা আর দুনিয়াতে নেই। তিনি পাড়ি জমিয়েছেন অন্য জগতে।

রুকাইয়্যা মক্কার হাজুন নামক গোরস্থানে গিয়ে তার কবরের পাশে অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে দাঁড়ালেন। যেখানে শুয়ে আছেন তার স্নেহময়ী মা খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এরপর তিন বছর কিংবা তার চেয়েও কম সময় রুকাইয়্যা তার স্বামী উসমান ও পুত্র সন্তান আব্দুল্লাহকে নিয়ে নিজ পরিবার ও

বোনদের সাথে মক্কায় বসবাস করেন। অতঃপর যখন মদীনায় হিজরত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ আসলো, তখন রুকাইয়্যা رضي الله عنها তাঁর স্বামী ও সন্তানসহ হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন। উসমান ও রুকাইয়্যা رضي الله عنهما আবিসিনিয়া ও মদীনা দুই স্থানেই হিজরত করার মর্যাদা অর্জন করলেন। তারা মদীনায় অন্যান্য মুহাজির সাহাবী ও আনসারদের সাথে বসবাস করতে থাকলেন।

আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমত বুঝা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। মদীনায় তাদের মধুর দাম্পত্য জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মদীনায় পৌছার দেড় বছর পরেই দ্বিতীয় হিজরীতে রুকাইয়্যা رضي الله عنها জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন রুকাইয়্যার অবস্থা ছিল খুবই মারাত্মক। তাই যুদ্ধে বের হওয়ার আগে নিজ কন্যাকে দেখতে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কন্যার অবস্থা দেখে তাঁর মনে দয়া-মমতা জেগে ওঠলো। তিনি মন থেকে কামনা করলেন, এসময় যদি নিজ মেয়ের পাশে থাকতে পারতেন, তাহলে প্রাণবায়ু বের হওয়ার সময় নিজের মেয়ের অবস্থা দেখে চক্ষু শীতল করতে পারতেন।

কিন্তু তিনি কি তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন? এটা তো আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর পথে জিহাদ। এ পথের সামনে কোনো কিছুই বাধা হতে পারে না। পারে না বাধা হতে কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততি। রুকাইয়্যার ঘর ত্যাগ করার পূর্বে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকাইয়্যার প্রতি শেষ দৃষ্টি দিলেন। অতঃপর উসমান رضي الله عنه এর সাথে কানে কানে কিছু কথা বললেন। তিনি চাইলেন, উসমান رضي الله عنه যেন তাঁর সাথে বদরের যুদ্ধে না যায়। তিনি যেন তাঁর কন্যার কাছাকাছি থাকেন। যাতে করে তিনি তার স্ত্রীর দেখাশুনা ও সেবা করতে পারেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই যায়েদ বিন সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় একটি সুখবর ছড়িয়ে দিলেন। কী সেই সুখবর? মুসলিমগণ বদরের যুদ্ধে জয়লাভ

করেছে। এই খবরে মদীনা আনন্দে ভরে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আরেক দুঃসংবাদ চলে আসলো। রাসূলের কন্যা রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা শেষ বিছনায় শায়িত হয়েছে। একই সময়ে মদীনায় আনন্দ ও দুঃখ এ দুটি খবরের একটি অন্যটির সাথে মিশে গেল। এটিই ছিল আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা, যা বাস্তবায়ন হওয়ারই ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন সর্বপ্রথম তার প্রিয় কন্যা রুকাইয়্যার কবর যিয়ারত করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তার মেয়ের কবর যিয়ারত করছিলেন, হঠাৎ দেখলেন ফাতিমাও তার বোনের কবরের পাশে কাঁদছেন। তিনি স্বীয় চাদরের পার্শ্ব দিয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর অশ্রু মুছে দিলেন।

এবার রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর পুত্র সন্তান আব্দুল্লাহর প্রসঙ্গে আসি। তার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু কিছু বর্ণনা অনুযায়ী তিনি রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মৃত্যুর কিছু দিন পরেই মৃত্যুবরণ করেন। একটি মোরগ তার মুখে ঠোকর মারে। এটিই তার মৃত্যুর কারণ হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ছয় বছর। এতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ব্যথিত হন। তার নানা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুব চিন্তিত হন অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তার কবরে নামেন।

অন্যান্য বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা জীবিত থাকতেই আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে। রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতার কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন অতিদ্রুত তার বাড়িতে আসেন। কারণ, তাঁর ছেলের জান বের হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি হয়ে গেছে। খবর পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গেলে, শিশুটিকে তাঁর কাছে দেওয়া হলো। তখন তার রূহ একেবারে কণ্ঠণালীর কাছে চলে এসেছিল। এদৃশ্য দেখে তার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি বের হচ্ছিল। কোনো

একজন সাহাবী এটা দেখে অবাক হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কী? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে রহমত। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে এটা ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে যারা রহম করে আল্লাহ তাদের উপর রহম করেন।

রুকাইয়্যার মৃত্যুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর করেছেন এবং তাঁর ছেলের মৃত্যুতেও সবর করেছেন। উসমান ﷛ ও তাই করেছেন।

উম্মে কুলসুম

বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

উম্মে কুলসুম খাদীজা এর গর্ভজাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় কন্যা। তার জন্ম তারিখ, ইতিহাস ও জীবনী সম্পর্কে বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু রুকাইয়্যা এর জন্ম হয় নবুওয়াতের ৭ বছর পূর্বে এবং ফাতিমা এর জন্ম হয় নবুওয়াতের ৫ বছর পূর্বে এবং যেহেতু এটা স্বীকৃত যে, রুকাইয়্যা উম্মে কুলছুমের বড়ো এবং ফাতিমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে ছোটো, তাই ধরে নেওয়া যায় যে, নবুওয়াতের ৬ বছর পূর্বে উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। তার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তার সম্পর্কে সর্বোচ্চ যা পাওয়া যাচ্ছে যৌবনের শুরুতে আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে তার বিবাহ হয়। কিন্তু উতাইবার সাথে ঘর সংসার শুরু করার আগেই তাঁর ভাগ্যকপালে নেমে আসে এমন অনাকাঙ্খিত ঘটনা, যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, উসমান তাঁর প্রথম স্ত্রী রুকাইয়্যা কে অত্যাধিক ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসা রুকাইয়্যার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। রুকাইয়্যার মৃত্যুতে উসমান সবসময় চিন্তিত থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাকে চিন্তিত দেখে বললেন: হে উসমান! তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কী? উসমান বললেন, রুকাইয়্যার মৃতুতে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

রুকাইয়্যা মৃত্যুবরণ করার কয়েক মাস পরেই আল্লাহ তা'আলা উসমান কে উত্তম বদলা দান করলেন। তাঁকে এমন বিনিময় দিলেন, যার কারণে তাঁকে যুন নূরাইন বলা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমগণ তাঁকে এই নামেই ডাকবে। এবার আমরা ঘটনাটি বিস্তারিত জানব।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু র কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর স্বামী খুনাইস বিন হুযাফা আস্-সাহমী বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে তার দুই বন্ধু আবু বকর ও উসমানের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কাছে পেশ করেছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো জবাব না দিয়ে কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন। আর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, আমি এখন বিবাহ-শাদী করতে চাচ্ছি না। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব জবাব শুনে অবাক হলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন ও তাঁর দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন এবং বললেন: হাফসাকে বিবাহ করবেন এমন একজন লোক, যিনি আবু বকর ও উসমান থেকে উত্তম। আর উসমান বিবাহ করবেন, এমন একজন মেয়েকে, যে হাফসা থেকেও উত্তম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমারকে এই কথা বলছিলেন, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা তা শুনেছিলেন। এরই মধ্যে উতাইবা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হয়ে উম্মে কুলসুমের জীবনের সুদীর্ঘ ১৬টি বছর পার হয়ে গেছে। সম্ভবত উম্মে কুলসুমের মনে প্রশ্ন জেগেছিল কে সেই মহিলা যে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উত্তম? কে সেই মহিলা যাকে উসমান বিবাহ করবেন?

উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট প্রস্তাব আসলো। উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা র মনে পড়লো সেই দীর্ঘ দিনের স্মৃতি। যেদিন কুরাইশী যুবক উতাইবা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। নূতন প্রস্তাবে আজ একদিকে যেমন তার মনে আনন্দ বয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে পুরাতন স্মৃতি তাকে করছিল দুঃখভারাক্রান্ত। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ভালো কে? বংশ মর্যাদা, চরিত্র ও দ্বীনের দিক থেকে উসমান থেকে উত্তম কে আছে? উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বোন রুকাইয়্যার সাথে এমন উত্তম ব্যবহার করতেন, যা কোনো পুরুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

যাই হোক উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রস্তাবে উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্মতি দিলেন। এটা ছিল তৃতীয় হিজরী সালের ঘটনা। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বিবাহ সম্পন্ন হলো। তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে ৬ বছর ঘর সংসার করলেন। এর মধ্যে তিনি ইসলামের অনেক বিজয় দেখেছেন। উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতাকে একের পর এক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছেন। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামীকে রাসূলের সাথে যোগদান করে সবকিছু দিয়ে সহযোগিতা করতে দেখেছে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন ধনী লোক। তাঁর সমস্ত সম্পদকে তিনি আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। আল্লাহর রাসূল যখন রুমা নামক কূপটি ক্রয় করে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেওয়ার জন্য আহব্বান জানিয়েছিলেন, তখন তিনিই এই কাজে সাড়া দিয়েছিলেন। এটা ছিল ইহুদীদের। তারা এখান থেকে মুসলিমদেরকে বিনামূল্যে পানি সংগ্রহ করতে বাধা দিতো। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা ক্রয় করে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিবো। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চাই না।

মাসজিদে নাববী সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন, কে আমাদের মাসজিদটি প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করবে? উসমান তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা করব। অতঃপর তিনি মাসজিদের পার্শ্বস্থ জমি ক্রয় করে মাসজিদ প্রশস্ত করলেন।

আর তাবুক যুদ্ধের দিন ৯৫০টি উট ও ৫০টি ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই উম্মে কুলসুমের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। সে তার স্বামীকে উৎসাহ দিতো। উম্মে কুলসুম তার পিতা আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছে, হে আল্লাহ! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

আল্লাহ তাআ'লার অলংঘনীয় ফায়সালা এই ছিল যে, তিনি তাঁর স্নেহময় পিতার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখবেন না। যেমন দেখবেন না তার প্রিয় স্বামী উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা। এটা ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত। তাই তিনি এই দুঃখজনক ঘটনাগুলো না দেখেই তার পিতা ও স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই নবম হিজরীর শা'বান মাসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভাব্য সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তাঁর রোগের অবনতি ঘটতেই থাকে এবং ঐ বছরই তাঁর মৃত্যু হয়।

উম্মে আতীয়া, আসমা বিনতে উমাইস, সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব সহ অন্যান্য মহিলাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তার গোসল সম্পন্ন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। মদীনার বাকী গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে তাঁর স্বামী ও পিতা মারাত্মক ব্যথিত ও চিন্তিত হলেন।

আনাস বলেন, আমি দেখেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে কুলসুমের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলছেন। ক্রন্দন যদি ইসলামী শরীয়তের সীমা রেখার মধ্যে হয়, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। তাতে যদি চেহারায় চপোটাঘাত করা না হয়, শরীরের জামা ছেড়া না হয় এবং তাকদীরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করা হয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। মূলত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারের পবিত্র সদস্যগণ আমাদের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নায় আদর্শ স্বরূপ।

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তিনি হলেন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার মাতা উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে ছোটো মেয়ে। তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। বেশ কিছু দিক থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাদৃশ্য রাখতেন। বিশেষ করে তার পথ চলার ধরন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতোই।

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়িতে যেতেন তখন তিনি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে স্বাগত জানাতেন এবং তার দিকে এগিয়ে যেতেন, তাকে চুমু দিতেন ও তাঁর আসনে বসাতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর বাড়িতে যেতেন তিনিও অনুরূপ করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন নাশের জন্য শত্রুরা যে পরিকল্পনা করেছিল, তা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তা জেনেও তিনি হতাশাগ্রস্ত হননি।

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সকল মুসলমানের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্রী। তিনি ছিলেন পিতার স্নেহধন্য কন্যা, মমতাময়ী মা, দায়িত্বশীল স্ত্রী, একজন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সর্বোপরি নারীদের জন্য একজন পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁর পিতার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি অন্য মহিলাদের সাথে তুলনীয় ছিলেন না, তিনি ছিলেন অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মৃত্যুর পর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর যোগ্যতা ও ফযীলতের জন্য ইসলামে তাঁর এ

মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর এ অবস্থানকে মারইয়াম আলাইহাস সালামের অবস্থানের সাথে তুলনা করা যায়।

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্নমুখী বর্ণনা পাওয়া যায়। সুন্নী ঐতিহাসিকদের মতে তিনি নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বড়ো বড়ো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। নবুওয়াত পাওয়ার পর নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের পক্ষ হতে যেসব যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাতে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে সাহায্য করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর বিরোধী ও দুশমন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের সামনে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করত। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এগুলো নিজ হাতে পরিস্কার করতেন। এমনি আরো অনেক অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট স্বীয় পিতার সাথে ভাগাভাগি করে ভোগ করেছেন। কারণ, তিনি এটা বুঝতে মোটেই ভুল করেননি যে, তাঁর পিতা নবুওয়াত ও রিসালাতের যে গুরুদায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ হতে পেয়েছেন, তা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে তাঁর পিতার পাশে দাঁড়াতে হবে। বাধা-বিপত্তি কষ্ট যা কিছুই এ পথে আসুক না কেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কাবা ঘরের নিকট সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহেল ও তার সাথীরা তখন অদূরেই বসা ছিল। তাদের একজন অন্যজনকে বলতে লাগলো, গত রাতে অমুক গোত্রের যেই উটটি মারা গেছে, তার নাড়িভূড়ি এনে কে মুহাম্মাদের ঘাড়ে সাজদা অবস্থায় চাপিয়ে দিতে পারবে? নিকৃষ্ট উকবা বিন আবু মুআ'ইত একাজে এগিয়ে আসলো এবং তা নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাজদায় যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। অতঃপর তিনি যখন সাজদায় গেলেন, তখন মৃত উটের নাড়ি-ভূড়ি তাঁর পবিত্র পিঠের উপর চাপিয়ে দিলো। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

বলেন, আমি এই দৃশ্য দেখছিলাম। কিন্তু আমার করার কিছুই ছিল না। তিনি সাজদা থেকে মাথা উঠাতে পারছিলেন না। এদৃশ্য দেখে কাফিররা হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের উপর লুটিয়ে পড়ছিল। খবর পেয়ে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) দৌড়িয়ে এসে তাঁর পিতার পিঠের উপর থেকে উটের নাড়ি-ভূড়ি সরিয়ে দিলে, তিনি সাজদা থেকে মাথা উঠালেন।

একজন মাতা যেমন তার সন্তানের দেখাশুনা ও লালন-পালন করে, ছোটো বেলা থেকেই ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) প্রিয়নাবীকে ঠিক সেভাবেই দেখা-শুনা করতেন। কোনো যুদ্ধে তিনি আহত হলে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ই চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতেন, অসুস্থ হলে পাশে থাকতেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ:

হিজরতের পর রাসূল যেসব জিহাদ করেছেন, তাতে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ও তাঁর পিতার সাথে শরীক ছিলেন। বদরের যুদ্ধে শরীক হয়ে তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে পিতার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদ যুদ্ধে যখন তিনি আহত হলেন, ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ক্ষতস্থান ড্রেসিং করেছেন এবং ব্যান্ডেজ লাগিয়েছেন। ঐতিহাসিক ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন যে, কয়েকজন মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উহুদ যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ও ছিলেন। এ যুদ্ধে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যখন তাঁর চেহারা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিতাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর চেহারা মোবারক থেকে রক্ত মুছতে লাগলেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন আর ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তা দিয়ে তাঁর পিতার চেহারার রক্ত ধৌত করছিলেন।

ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যখন দেখলেন রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না, তখন একখণ্ড পুরাতন চাটাই এনে পুড়লেন এবং এর ছাই আহত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। উহুদ যুদ্ধে পিতার চিকিৎসা করার

পাশাপাশি যুদ্ধ করারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ তিনি ছিলেন নববধূ। তখনো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে তাঁর বিবাহের এক বছর অতিক্রম হয়নি।

খন্দকের যুদ্ধেও অন্যান্য মহিলার সাথে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পেছনে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ও বীরত্ব প্রদর্শনের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম হিজরীতে যখন খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন তাতে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর পিতা ও স্বামীর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর বয়স যখন আঠারো বছর তখন তিনি তাঁর বোন উম্মে কুলছুম এবং উম্মুল মুমিনীন সাওদা বিনতে যামআসহ যায়েদ বিন হারেসার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বিবাহঃ

হিজরতের এক বছর পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক সাহাবী ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো প্রস্তাবেই সম্মতি দেননি। এ ব্যাপারে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীর এ মনোভাব বুঝতে পারেন। তিনি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু র সাথে বিয়ে দিতে চান। তিনি উভয়ের কাছে এ কথা উপস্থাপন করলে তাঁরা দুজনই এ ব্যাপারে চুপ থাকেন। রাসূলে আকরাম দুজনের মৌনতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে নেন এবং বিবাহের আয়োজন করেন।

ফাতিমা ছিলেন নারীদের জন্য আদর্শ। অন্যদিকে আলী ছিলেন নবুওয়াতী মিশনের অন্যতম ইমাম। তাঁরা ছিলেন উত্তম দম্পতির এক অনন্য উদাহরণ।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের পর আলী বিন আবু তালেব এর সাথে ফাতিমা এর এই পবিত্র বিবাহ সম্পন্ন হয়। রাসূলদের সরদার বিশ্বনাবীর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার বিবাহের মোহরানা ছিল খুবই নগণ্য। তিনি যে অল্পতে সন্তুষ্ট থাকতেন এটাই তার প্রমান। উহুদ যুদ্ধের পর তাঁর সাথে আলী র ঘরসংসার শুরু হয়।

এ দম্পতির বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা ছিল খুবই সাধারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে ডেকে তাঁর ঢালটি বিক্রি করে বিয়ের জন্য অর্থ যোগাড় করার পরামর্শ দেন। আলী ঢাল বিক্রি করে দুইশত দিরহাম পান। যা দিয়ে তিনি ফাতিমা এর দেনমোহর পরিশোধ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমপরিমাণ দিরহাম মিলিয়ে নব-দম্পতির ঘরের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ক্রয় করার জন্য তাঁর সাহাবীদের কাছে দেন। বিবাহের যাবতীয় কাজ মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেন। বিয়ের পর নব-দম্পতির জন্য আলাদা একটি ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। ঘরটি ছিল মাসজিদে নাববীর এলাকার ভেতরে নাবীজীর ঘরের কাছাকাছি।

ফাতিমা এর জবনীতে রয়েছে মুসলিমদের মেয়েদের জন্য ইবাদত-বন্দেগী, সংগ্রাম, যুদ্ধ-জিহাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে যে, ফাতিমা রাসূলের সর্বাধিক প্রিয় কন্যা হওয়া সত্ত্বেও আলী র ঘরের সবকাজ নিজেই করতেন। তিনি নিজ হাতে যাঁতা ঘুরাতেন। এতে করে তার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি পানির কলসী বহন করতেন। এতে তার কোমরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি নিজ হাতে ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিতেন। এতে তার পরিহিত কাপড় ময়লাযুক্ত হয়ে

যেত। এসব কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি যখন তাঁর পিতার নিকট একজন খাদেম চাইলেন, তখন তিনি তাকে তা না দিয়ে প্রত্যেক সালাতের পর এবং বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার সময় কিছু তাসবীহ, তাকবীর ও প্রশংসার বাক্য শিক্ষা দিয়ে বললেন, খাদেমের সাহায্য নেওয়ার চেয়ে এগুলোই তোমাদের জন্য ভালো হবে।

মোট কথা, প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে খাদেম না দিয়ে নিজ হাতেই স্বামীর বাড়ির খেদমত করার আদেশ দিলেন এবং ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি উৎসাহ দিলেন। এটা তিনি এজন্য করলেন, যাতে মুসলিমদের মেয়েদের জন্য তাঁর এই প্রিয় কন্যা ইবাদত-বন্দেগী, স্বামীর সেবা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও অন্যান্য বিষয়ে উত্তম আদর্শ হয়ে থাকেন এবং মুসলিমদের মেয়েরা যেন তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর পথ অবলম্বন করে।

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর সন্তানাদিঃ

- **হাসান বিন আলীঃ** তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের নাতী। তাঁকে ও তাঁর ছোটো ভাই হুসাইনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার দুটি ফুল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা হবেন জান্নাতে যুবকদের সরদার। তিনি ৪৯ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।
- **হুসাইন বিন আলীঃ** হাসানের ন্যায় হুসাইনকেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাদের মর্যাদায় অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৬১ হিজরীর মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে কারবালার প্রান্তরে কুফাবাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।
- **মুহসিন বিন আলীঃ** শিশুকালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- **যায়নাব বিনতে আলীঃ**
- **উম্মে কুলসুম।**

উল্লেখ্য যে, ফাতিমার সন্তানরাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর। ফাতিমার সন্তানগণ ব্যতীত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোনো কন্যার সন্তান জীবিত থাকেনি। সকলেই শিশুকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

ফাতিমা এর ফযীলত:

ফাতিমা র অনেক ফযীলত রয়েছে। বনী আদমের যেসব নারী ঈমান ও আমলে পূর্ণতা হাসিল করেছেন, তার মধ্যে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যতম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জান্নাতী নারীদের প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ»

"ফাতিমা হবেন জান্নাতী নারীদের প্রধান" । (সহীহ বুখারী)

সহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় ফাতিমা আসলেন। আল্লাহর কসম! তার হাঁটার ধরন ঠিক রাসূলের হাটার মতোই ছিল। তিনি যখন ফাতিমাকে দেখলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানালেন। অতঃপর তাঁকে তাঁর ডান দিকে বসালেন। তার সাথে গোপনে কিছু কথা বললেন। এতে তিনি প্রচুর কাঁদলেন। তাঁকে চিন্তিত ও কাঁদতে দেখে দ্বিতীয়বার গোপনে কথা বললেন। এতে তিনি হাঁসতে লাগলেন। আয়েশা বলেন, আমি তাঁকে কাঁদা ও হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূলের গোপনীয়তা কখনো ফাঁস করব না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যু বরণ করলেন, তখন আয়েশা জোর দিয়ে

সেই কান্না ও হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এবার ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এখন সেই কথা বলতে আর কোনো অসুবিধা নেই। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তিনি যখন প্রথমে আমার সাথে গোপনে কথা বলেছেন, তখন তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, জিবরীল আমাকে প্রত্যেক বছর একবার কুরআন শুনিয়ে থাকেন। কিন্তু এবার আমাকে দুইবার শুনিয়েছেন। আমার ধারণা এটা এজন্য যে, হয়ত আমার মৃত্যু ঘণিয়ে আসছে। অতএব, তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। এতে আমি প্রচুর কেঁদেছি। যেটি আপনি দেখেতে পেয়েছেন। আর তিনি যখন আমাকে চিন্তিত ক্রন্দনরত দেখলেন, তখন তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতী মহিলাদের প্রধান হবে? (সহীহ বুখারী)

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মৃত্যু: তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর ছয় মাস পর ১১ হিজরী সালের রামাযান মাসের ৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ অথবা ২৫ বছর। ঐতিহাসিক মাদায়েনী বলেন, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৯ বছর। ওয়াকেদী ও ইবনে আছারীও অনুরূপ বলেছেন।

ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর জন্যই সর্বপ্রথম মৃতদেহ বহনের খাট প্রস্তুত করা হয়। এর উপর লাশ রেখে উপরের দিক থেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এটা ছিল অনেকটা তাঁবুর মতো। এটা যেহেতু পর্দার জন্য অধিক উপযুক্ত তাই ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর অসীয়ত মোতাবেক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবেই তাঁর খাট তৈরি করেছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতিমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। গোসল দেওয়ার সময় তারা দুইজনই ভিতের ছিলেন। অন্য কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

ফাতিমা এর জানাযার সালাতে কে ইমামতি করেছেন, এনিয়ে মতভেদ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, আলী নিজেই তার জানাযার সালাতে ইমামতি করেছেন। কেউ বলেছেন আবু বকর সিদ্দীক ; আবার কেউ বলেছেন ফযল বিন আব্বাস । কেউ কেউ বলেছেন যে, আলী এর সাথে ফযল ও ফাতিমা এর কবরে নেমেছিলেন। মানুষের বাড়াবাড়ির আশঙ্কায় রাতের অন্ধকারে আলী তাঁর জন্য একাধিক কবর খনন করে যে-কোনো একটিতে দাফন করে ফেলেন। তাই আজও তার কবরের স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তাঁর দাফনের সময় পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী ছাড়া মুসলিমদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ফাতিমা এর অসীয়ত মোতাবেক রাতের অন্ধকারে তাঁকে দাফন করা হয়। মদীনার বাকী গোরস্থান কিংবা অন্য কোনো স্থানে তাঁর কবর রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোথায়? তা জানা সম্ভব হয়নি।

ফাতিমা এর মৃত্যুতে আলী খুব ব্যথিত হন। তাঁর মৃত্যুতে মদীনার সর্বত্রই দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ সন্তানের বিচ্ছেদে কাঁদতে কাঁদতে সাহাবীদের দাড়ি ভিজে যায়।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দুআ করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাদের অন্তরে তোমার প্রিয় রাসূল ও তাঁর পবিত্র পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দাও। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম ভাই-বোনকে রাসূলের পবিত্র পরিবারের সদস্যদেরকে অনুসরণ করার তাওফীক দাও। পরকালে তাদের সাথে আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান করে দাও। আল্লাহুম্মা আমীন।

০১/০৩/২০২০ ইং

আত তাওহীদ
01712 549956 01841 549956 01940 628472
atpbd04@gmail.com /ATP BD